ট্যাবলয়েড সংবাদপত্র ও অ
াজকের সাংবাদিকতা

স্বাতী ভট্টাচার্য

যাঃ , গার্ডিয়ানও ট্যাবলয়েড হয়ে গেল।

বিলেতে ওজনদার দৈনিক বলতে চারটে, দ্য ইন্ডিপেন্ডন্ট, দ্য টাইম, দ্য গার্ডিয়ান আর দ্য ডেলি টেলিগ্রাফ। বিক্রির সংখ্য ায়'সান' বা 'ডেলি মিরর' -এর মতো ট্যাবলয়েডগুলো দীর্ঘদিন ধরে টেক্কা দিয়ে আসছে এই চার 'ব্রডশিট' কাগজকে। ত ার উপর ২৪ ঘন্টা ইন্টারনেটে হরবখত ফ্রি নিউজ, যে - কোনো কাগজের ইন্টারনেট সংস্করণ কেবল ক্লিক - এর অপেক্ষ ায়। ফলে নববইয়ের দশকে বড়ো কাগজগুলোর পাঠকসংখ্যা ক্রমশ চড়চড় করে কমে আসছিল। সেই পড়ন্ত বিক্রিকে চা গিয়ে তুলতে আয়তনে পরিবর্তন আনার ঝুঁকিপ্রথম নিয়েছিল ইন্ডিপেন্ডন্ট। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে টেবিল - ঢাকা সাইজের কাগজ হয়ে গেল টেবিল ম্যাট সাইজের ট্যাবলয়েড। তার ছয় সপ্তাহ পরেই টাইম কাগজ তার দীর্ঘ ট্র্যাডিশন ভেঙে ছোটো আকারে এল বাজারে। ফলও পেল দুটো কাগজই--- ছয় মাসের মধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্টের প্রচারসংখ্যা বাড়ল ২০ শতাংশ, টাইম - এর পাঠকসংখ্যা বেড়েছে এক বছরে ৪.৫ শতাংশ। অন্যদিকে, গার্ডিয়ান খুইয়েছে প্রায় ২৫ হাজার পাঠক। অতএব এই ১২ সেপ্টেম্বর থেকে, ১৮৪ বছরের ট্র্যাডিশনের মায়া ভুলে, দ্য গার্ডিয়ানও হ্রস্বাকার। একেবারে ট্য াবলয়েড নয় অবশ্য, স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে তার চেয়ে একটু বড়ো -- ১২.৫ ইঞ্চি বাই ১৮.৫ ইঞ্চি। কাজের দুনিয়ার এই সাইজকে বলে 'বার্লিনার', যদিও জার্মানির রাজধানী থেকে আজ আর এই সাইজের একটাও খবরের কাগজ বেরোয় ন া,বরংফ্রান্সের ল্য মোন্দ্, ইতালির লা রেপুবলিকা আর বার্সিলোনার লা ভ্যানগুয়ার্দিয়া হল এই 'বার্লিনার'অ সাইজের দৈনিক। ট্যাবলয়েডের মাপ সেখানে ১১.৫ ইঞ্চ বাই ১৪.৭ ইঞ্চি।

প্রতিযোগিতায় গার্ডিয়ান দু-বছরে পিছিয়ে পড়েছে, বিক্রি নেমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র সাড়ে তিন লক্ষে, তার ওপর নতুন করে খবরের কাগজ বার করতে ৮০ মিলিয়ান পাউন্ড খরচ করে যন্ত্রপাতি বসিয়েছে। সুতরাং সাইজ খাটো করে বিক্রি ব াড়ানোর চেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হয়, তা নিয়ে নিশ্চয় বেজায় টেনশনে আছেন গার্ডিয়ানের সম্পাদক, অ্যালান রাসব্রিজার। তবে যা এখনি জলের মতো পরিষ্কার তা হল, ব্রিটেনের জাতীয় দৈনিকের বাজারে আর মাত্র একটা কাগজ রয়েছে, যা অ ামাদের চেনা মাপের খবরের কাগজ, বা ব্রডশিট। তা হল ডেলি টেলিগ্রাফ। ব্রিটেনের জাতীয় কাগজগুলোই শুধু নয়, দ্য স্কটসম্যান বা দ্য বেলফাস্ট টেলিগ্রাফের মতো আঞ্চলিক দৈনিকও ট্যাবলয়েড হয়ে গিয়েছে।

ব্যবসায়িক কাগজগুলোও থেমে নেই। এই তো অক্টোবর থেকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এশিয়া এবং ইউরোপ সংস্করণ হয়ে যাচ্ছে ট্যাবলয়েড। এ-ঢেউ লেগেছে খোদ এশিয়ার মিডিয়া জগতেও। এ - বছরই এপ্রিলে মালয়েশিয়ার প্রাচীনতম ইংরেজি দৈনিক, নিউ স্ট্রেটস টাইমস, ১৬০ বছরের ব্রডশিটের ঐতিহ্য স্মৃতির সিন্দুকে তুলে রেখে ট্যাবলয়েড হয়ে এল ব াজারে এক সাক্ষাৎকারে এডিটর ইন চিফ কালিমুল্লা হাসান বলেছেন, 'ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল আমাদের। এ আমাদের দুঃখের দিন, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে যা রূঢ় সত্য তা আমাদের মেনে নিতেই হবে।' সেই সত্য হল এই যে, 'দ্য স্ট ার' নামে ট্যাবলয়েড আকারের একটি ইংরেজি দৈনিকপ্রচার সংখ্যায় অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে নিউ স্ট্রেট টাইমসকে। নিউ স্ট্রেট টাইমস যেখানে ১ লক্ষ ২৯ হাজার, স্টার সেখানে প্রায় ৩ লক্ষ। এরপর কাগজ ছোটো না করে উপায় কী?

কাগজের পাঠকেরা যে ট্যাবলয়েড সাইজের কাগজ পছন্দ করে, সে নিয়ে তেমন সন্দেহ নেই। ছোটো সাইজের কাগজ

সহজে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া চলে ট্রেনে - বাসে, ভাঁজ করতে গেলে দুমড়ে - মুচড়ে একাকার হয় না। মস্ত কাগজের পাত
ার নানা কোণে খবরের সন্ধান করে বেড়াতে হয় না, ছোটো পাতার মাত্র দুটো কি তিনটে খবর সহজেই খুঁজে পাওয়া য
ায়। বিশেষত মহিলা এবং অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের কাছে ট্যাবলয়েড যে বড়ো কাগজের চেয়ে বেশি পছন্দসই, তা ইউরে
াপ আর আমেরিকায় নানা সমীক্ষায় স্পষ্ট হয়েগিয়েছে। মুশকিল হল, পাঠক হারানোর খবরের কাগজের জন্য যে দাম প
াওয়া যায়, তা থেকে কাগজগুলোর বড়ো জোর ২০-৩০ শতাংশ খরচ ওঠে। বাকিটা ওঠে বিজ্ঞাপন থেকে, আর বিজ্ঞ
াপনদাতারা ছোটো সাইজের কাগজ তেমন পছন্দ করেন না। বড়ো কাগজের পাতা - জোড়া বিজ্ঞাপনে যে - কোনো পণ্য
অনেক তরিবত করে 'ডিসপ্লে' করা যায়। প্রায় টিভি স্ক্রিনের বিজ্ঞাপনে যে - কোনো পণ্য অনেক তরিবত করে 'ডিসপ্লে' করা
যায়। প্রায় টিভি স্ক্রিনের সাইজের কাগজের চেয়ে ট্যাবলয়েডের খুদে পাতার বিজ্ঞাপনের সাইজ ঠিকঅর্ধেক, তা হলে বিজ্ঞ
াপনদাতারা একই রেটে পয়সা দিতে যাবে কেন? এই কারণে, ইউরোপের যতগুলো কাগজ ট্যাবলয়েড হয়েছে, তাদের প্র
ায় প্রতিটিরই পাঠক বাড়লেও, বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের পরিমাণ গোড়ায় অনেকটাই কমছে। বছর দুয়েক পরে আবার অ
াস্তে আস্তে তা বেড়ে ক্ষতির পরিমাণ পুষিয়ে নিয়েছে, বলছেন মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা। এই কারণেই আমেরিকার জাতীয়
দৈনিকগুলোয় এখনো ট্যাবলয়েডের হুজুগ তেমন ভাবে ওঠেনি। ইউরোপে কাগজ - পিছু ক্রেতার থেকে যত আয় হয়, অ
ামেরিকায় হয় তার চেয়েও কম। অর্থাৎ কাগজ ছাপার দামের বেশির ভাগটাই তুলে দিচ্ছেন বিজ্ঞাপনদাতারা, তাঁদের দ
াপটও সেই কারণে বেশি। তাই সান ফ্রান্সিসকোর'দ্য একজামিনার' কাগজের মতো দু-একটা দৈনিক ছাড়া এখনো কোনো
বড়ো দৈনিক ট্যাবলয়েড হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সে আর কতদিন? পাঠকের সংখ্যা যদি কমে, তা হলে শেষ অবধি বিজ্ঞাপনদ
াতাদেরও নড়েচড়ে বসতেই হবে। গত বছরে আমেরিকায় সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা ৮ শতাংশ কমছে। সেখানকার
ডিজাইনার, প্রকাশকরাও স্বীকার করছেন যে, ২০২০ সালে মধ্যে ডশিট ব্যাপারটাই হিতহাস হয়ে যাবে। তবু অস্ট্রেলিয়া
থেকে আর্জেন্টিনা অবধি ট্যাবলয়েড করণ শু হলেও, আমেরিকায় এখনো বিজ্ঞাপনদাতাদের চটিয়েতেমন ঝুঁকি নিতে কেউ
রাজি নয়।

আর ভারতে? ভারতের কাগজের অত সিঁটিয়ে থাকার কিছু নেই, কারণ ইউরোপ বা আমেরিকার মতো, আমাদের ক
াগজেরমালিকদের, পাঠকসংখ্যা নিয়ে 'গেল গেল' রব তোলার দশা এখনো হয়নি। সেখানে পাঠক কমছে, এখানে স
াক্ষরতার হাত ধরে পাঠকসংখ্যা বাড়ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, গত তিন বছরে ভারতের পাঠকের সংখ্যা ১৪ শত
াংশ বেড়েছে, যার বেশির ভাগটাই আঞ্চলিক ভাষার কাগজের। বিজ্ঞাপনের দিক থেকেও ভারতের সংবাদপত্র যথেষ্ট
সবল - গোটা মিডিয়ায় যত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তার ৪৬ শতাংশ পায় খবরের কাগজ। প্রতিষ্ঠিত কাগজগুলো প্রকাশ
করা হচ্ছে, সেগুলোও ব্রডশিট আকারেই বেরোচ্ছে। মুম্বইয়ে ডি এন এ (ডেলি নিউজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস) কাগজ শু
করল দৈনিক ভাস্কর এবং জি নেটওয়ার্ক, যা সম্পূর্ণ নতুন, প্রায় ১০০ পাতার ব্রডশিট।বাংলায় নবতম দৈনিক দ্য স্টেটসম্য
ান, সেও ব্রডশিট। একটা নতুন ট্যাবলয়েডও অবশ্য শু করেছে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রকাশকরা, তার নাম মুম্বই মিরর।
তবে তা প্রধানত অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের আকর্ষণের জন্য, আর সে - শহরের (মুম্বই) প্রতিষ্ঠিত ট্যাবলয়েড কাগজ 'ডিম
ডে'-র সঙ্গে লড়াইয়ে মুম্বই মিরর তেমন দাঁড়াতেও পারছে না। ট্যাবলয়েড আকার আমরা এখন প্রধানত দেখি অপরাহ্ব
া সান্ধ্য দৈনিকে, যা মেজাজে, মর্যাদায় প্রভাতী কাগজের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ-ছাড়া দ্য হিন্দু বা দ্য টেলিগ্রাফের মতো
কিছু ইংরেজিকাগজ তাদের ফিচার বিভাগগুলো নিয়মিত ট্যাবলয়েড আকারে প্রকাশ করছে। তবে হ্রস্বকরণের প্রয়োজন
যে আমাদের দৈনিকগুলির হয়নি, তাও নয়। নিউজপ্রিন্টের চড়া দামের কারণে গত বছর খানেকের মধ্যে প্রায় সব ক-টি জ
াতীয় দৈনিক চওড়ায় ৩৬ সেন্টিমিটার থেকে কমে ৩৩ সেন্টিমিটার এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও বেশিরভাগ কাগজই একে 'স্ম
ার্ট লুক' বা 'ইন্টারন্যাশনাল লুক' বলে চালাতে চাইছে, আসল কারণ টাঁকের টান।

কিন্তু সংবাদপত্রের ট্যাবলয়েড হয়ে ওঠা মানে তো কেবল আকারে ছোটো হওয়া নয়, তা সে সংবাদের চরিত্র নিয়েই টান
াটানি। ট্যাবলয়েড দৈনিক বলতে সংবাদিকতার একটা ধারাই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে, যেখানে ক্লিন্টনের বিদেশনীতির চাইতে
মনিকা লিউনস্কির সঙ্গে তার কেচ্ছা অনেক, অনেক বেশি জায়গা জুড়ে বসে, যেখানে রাষ্ট্রনীতি এঁটে উঠতে পারে না ফ্যাশ
ান, সিনেমার সঙ্গে। সেইঅর্থে পাক্কা ৩৬ ইঞ্চি বহর নিয়েও বহু কাগজ ট্যাবলয়েড হয়ে উঠেছে। বছর তিনেক আগে
বিলেতের কাগজগুলো নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ হয়েছিল। সেই সময় পপ গানের এক অনুষ্ঠানে এক পুষ পপস্টার স্টেজে

গাইতে গাইতে তার সঙ্গী মহিলা স্টারের পশ্চাদ্দেশে হাত দেন, ইংরিজিতে যাকে বলে 'গ্রোপ' করা। অবাক হয়ে দেখেছিল াম, সেখানকার ট্যাবলয়েডগুলো কেবল নয়, টাইম বা গার্ডিয়ানের মতো দিমাগ - দেমাকী কাগজগুলোও প্রথম পাতায় ফলাও করে সে - ছবি ছাপল, রিপোর্টও লিখল। ভদ্র ভাষায় একে বলে ট্যাবলয়েডাইজেশন, সোজা সাপটা বললে, 'জ ামবিং ডাউন।' ফলে কোনো ঘটনার 'খর' হয়ে ওঠার শর্তগুলোই পালটে যায়। জ্যানেট জ্যাকসনের 'ওয়ার্ডরোব ডিসফ াংশানের' মতো খবরকে কাগজের প্রথম পাতায় ফলাও করে ছাপার প্রস্তাব দিলে গৌরকিশোর ঘোষ হয়তো মূর্ছা যেতেন, অন্তত বেজায় রাগ করতেন তা নিশ্চিত, কিন্তু আজকের সম্পাদকের কাছে তা নেহাত জলভাত। সংবাদের এই 'অবমূল্য ায়ন' নিয়ে বহু কথা হয়েছে, হচ্ছে, তবে সেই কথা বেশিরভাগ সময়েই একটা হতাশা - মিশ্রিত নিন্দা। তার মধ্যে 'ছ্যা ছ্যা' করার ইচ্ছেটা যত প্রখর, বিশ্লেষণের ঝোঁকটা তত প্রবল নয়। সংবাদমাত্রই ভুয়ো, সাংবাদিক মাত্রই দালাল, এমন আলে াচনায় মনের ঝাল অনেকটা ঝাড়া যায় ঠিকই, কিন্তু 'কেন,' 'কতখানি', 'কী উদ্দেশ্যে'--- এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তেমন মেলে না।

প্রথমত, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত দৈনিক, তাদের সংবাদ পরিবেশনের নকশায় খুব পরিবর্তন যে হয়েছে, সেই কথাটাই অনেকে স্ব ীকার করতে চায় না। টাইম বা গার্ডিয়ান, যে - কোনো কাগজের কর্তৃপক্ষই বলবেন, খবরে তাঁরা সিরিয়াস বিষয়কে যথেষ্ট গুত্ব দেন।অন্য বিষয়গুলো এখন অর্ন্তভুক্ত করেছেন বটে, তবে তার জন্য পাতাও বাড়িছেছেন। অতএব রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের বরাদ্দ কমেনি,অন্য খবরের বরাদ্দ বেড়েছে। এমন কথা ভুল প্রমাণ করতে কেবল ধারণায় কাজ চলে না, চ াই সমীক্ষা এবং গবেষণা। এমন একটি সমীক্ষা ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৭, এই ২০ বছরের সংবাদ খতিয়ে দেখেছে। গবেষকরা বলেছেন, ১৯৯৭ সালে স্ক্যান্ডাল নিয়ে লেখা খবর ছিলএক শতাংশেরও কম, ১৯৯৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশ। এই একই সময়কালে টাইম ম্যাগাজিনের সরকার সম্পর্কিত খবর ১৫ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় চার শতাংশে, যেখানে বিনোদন ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ শতাংশে। সুতরাং খবরের নকশায় মৌলিক পরিবর্তন যে সত্যিই এসেছে, তা মানতে হবে।

আমাদের দেশে এমন সমীক্ষা হয়েছে বলে জানা নেই। যদি তেমন সমীক্ষা হয়, তা হলেও ইংরেজির সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষ ার কাগজ, শহরের কাগজের সঙ্গে জেলার কাগজ, বড়ো কাগজের সঙ্গে মাঝারি কাগজের খবরের বন্টনের নকশায় প ার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। তবু তর্কের খাতিরে মোটের ওপর ওটা ধরে নেওয়া চলে যে, বড়ো মাপের সংবাদপত্র, অর্থাৎ যেগুলির প্রচারসংখ্যা ১০ লক্ষের উপরে, সেগুলিতে গত এক - দেড় দশকে রাজনীতি, রাষ্ট্র এবং প্রশাসন, যাকে সাংবা দিক পরিভাষায় 'হার্ড নিউজ' বলা হয়, তার প্রাধান্য কমেছে, বেড়েছে 'সফট নিউজের' প্রধান্য, যার মধ্যে প্রধানত পড়ে স্ক্য ান্ডাল, সেলিব্রিটি আর স্পোর্টস।

কিন্তু কেন এই পরিবর্তন? অনেকেই বলতে পারেন, কেন নয়? কেবল ভারিক্কি নীতির তাত্ত্বিক আলোচনা করে সংব াদপত্রকেসমাজের গোটাকয়েক মানুষের কুক্ষিগত করে রাখাই বা হবে কেন? পাঠক যা চায়, সংবাদপত্রকে তা দিতে হবে। আর পাঠক যদি সিনেস্টারের প্রেমলীলা পড়তে পয়সা খরচ করতে চায়, তা হলে তাকে জোর করে ইরাক - নীতি গিলিয়ে লাভটা কী? সংবাদপত্র না হয় পাত পেড়ে খাওয়ায়, কিন্তু ইন্টারনেটের খবর তো বুফে ডিনার। সেখানে মাপাও যায়, কে কোন খবর বেশি পড়ছে। লাইকোস সার্চ ইঞ্জিনে দেখা যাচ্ছে, জ্যানেট জ্যাকসনের বক্ষবন্ধনী ছিঁড়ে যাওয়ার খবর মার্স রে াভারের চেয়ে ২৫ গুণ বেশি 'হিট' হয়েছে। আর লোকে কীখবর পড়তে চায়, তা কেবল খবরের কাগজের উপরেও নির্ভর করে না। করে তার সামগ্রিক চিন্তার উপর। একটা সময় ছিল যখনলোকে বাস্তবিক বিশ্বাস করত, রাজনীতি মানুষের ভাগ্য বদলাতে পারে। রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে মানুষের জীবনধারা,সমাজের উন্নয়নের পথ আলাদা হয়ে যেতে পারে। আজ সে - বিশ্বাস আর নেই। এখন আমরা জানি, ম্যানিফেস্টো কেবল কথার কথা, আদর্শ ও বাণীসর্বস্ব। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মানে নেতাদের ক্ষমতা কাড়ার লড়াই, যেখানে জনগণ সতত উলুখাগড়া। তা হলে সেই কুৎসিত নেতাদের মিথ্যে কথ া পড়ে সকালটা নষ্ট করে লাভ কী?

এ - কেবল রাজনীতির নয়, একে গণতন্ত্রের সংকটই বলতে হবে। কিন্তু তা হলে সংবাদপত্রের দায়িত্ব কি আরো বেড়ে যায় না? ভোট পাঁচ বছরে একবার হয়, কিন্তু প্রশাসন নিত্যদিনের, সেখানে প্রতিনিয়ত অনুসন্ধিৎসু চোখ মেলে রাখাই তো স াংবাদিকের কাজ। নেতা যেমনই হোক, তার নীতি তো চাপছে মানুষের উপর। সেই নীতি নিয়ে সমালোচনার, আপত্তির,

প্রতিবাদের, অন্য কোনো মঞ্চযদি নাও থাকে, মিডিয়ার তার জায়গা তো বুজিয়ে ফেলা যায় না। গণতন্ত্র বড়ো দুর্লভ ধন, তাকে অমন আনমনে হারিয়ে ফেলা চলে না।

বড়ো ঠিক কথা, কেবল প্রশ্ন একটাই --- সংবাদপত্রে নীতি নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে আলোচনার জায়গা যে অপসৃত হচ্ছে, সে কী পাঠকের অমনোযোগের জন্য? নাকি অনাস্থার জন্য? বছর দু-এক আগে নিউ ইয়র্ক টাইমসের জেসন ব্লেয়ার নামে এক সাংবাদিককে বেশ ঘটা করে বরখাস্ত করা হয়েছিল, কারণ জানা গিয়েছিল যে, সে স্রেফ বাড়িতে বসে বানিয়ে রিপোর্ট লিখছে। তা নিয়ে দিন কতক বেশ হইচই চলেছিল। সেই সময় একটি 'গলাপ পোল' করা হয়েছিল জানতে যে, মিডিয়ার খবরের উপর কত মানুষ ভরসা করে। মাত্র ৩৬ শতাংশ মানুষ বলেছিলেন, তাঁরা মনে করেন যে, মিডিয়া সাধারণত ঠিক তথ্য পরিবেশন করে। ভারতে এমন সমীক্ষার কথা জানা নেই, তবে ফলাফলটা খুব ভিন্ন হবে কী? মনে আছে, কিছুদিন আগে একটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আগে ভাবতাম, খবরের কাগজে দিয়েছে, তা হলে ঠিক খবরই হবে। এখন ভাবতে হয়, কোন কাগজ লিখছে, কে লিখছে, কোন পাতায় লিখছে।

তবু তথ্যের সত্যতা নিয়ে এই সংশয়ের চেয়েও গভীর সংকটময় এক প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হবে আজকের সাংবাদিককে। তা হলে, সে কী আদৌ তার নিজের পরিবেশিত তথ্য বা তত্ত্বে বিশ্বাস করে? সে কী কেয়ার করে? তার পাঠকের যা দুশ্চিন্তা, তাতে কি সাংবাদিক আদৌ বিচলিত? যে সংবাদ লিখছে, যে সংবাদ পড়ছে, সে কি বিষয়টা সম্পর্কে লেখার মতো, বলার মতো, কিছু জানে? নাকিবাইলাইন আর সাউন্ডবাউটের দায় সেরেই সে দিনের কাজ শেষ করার তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে? সংবাদপত্রের খবর পড়ে বহুদিনইএ-চিন্তা কুরে কুরে খেতো। সম্প্রতি টি.ভি.-র খবর দেখলে এই অস্বস্তি আরো ঘুলিয়ে ওঠে। গুরগাঁওয়ে যে ছাঁটাই - হওয়া শ্রমিকরা মার খেলেন, তাঁদের খবর বলছিলেন যে কোন - টাই পরা তণী, যিনি বারবার 'ড্রামাটিক' শব্দটি ব্যবহার করছিলেন! ওই শ্রমিককুল, তাঁদের জীবনযাত্রা, তাঁদের জীবনমরণ সমস্যা সম্পর্কে তিনি সত্যিই কি কিছু জানেন? না কেবল আজকের ডিউটি করেছেন? যে - কোনো পরিস্থিতিতে, যে - কোনো ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁরা গুটিকতক গতে-বাঁধা প্রশ্ন করেন -- কেন এমন হল? অমুক কী বলছে? এরপর কী হবে? কিছুদিন আগে রাজদীপ সরদেশাই বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, সলমন - ঐশ্বর্যের টেপ নিয়ে এত জলঘোলা হল, কেউ জিজ্ঞেস করল না, মুম্বই পুলিশ চার বছর টেপ পেয়েও চেপে বসে রইল কেন? এ তো কেবল একটা প্রশ্ন, এমন কত প্রশ্ন রোজ বন্ধ ঘরে চড়াইয়ের মতো ঘুরপাক খায়। এন ডি . টি. ভি. -র বরখা দত্তকে যে এক সময়ে মানুষ এমন আপন করে নিয়েছিল, তার কারণ কেবল তাঁর সাহস, তাঁর সাংবাদিকতার উৎকর্ষ নয়, তিনি দর্শকের কাছে নিজের প্যাশনের, নিজের বোধের সততার পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন।

বিশ্বাসযোগ্যতা, বোধশক্তি, এই দুয়ের সংকটে পড়েছে সাংবাদিক, সংবাদমাধ্যম, কেন? একটা কারণ অবশ্যই সংবাদমাধ্যমে কর্পোরেটের আধিপত্য, যা ক্রমশ মনোপলিতে পর্যবসিত হচ্ছে। মাত্র কয়েকটি সংস্থা বা পরিবারের দ্বারা পৃথিবীর সংবাদপত্র - শিল্প নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ভারতেও এই পরিবারতন্ত্রের ছবি ভিন্ন নয়। সংবাদপত্র নিরপেক্ষ থাকবে, তা বস্তুত কেউ কোনোদিন আশা করেনি। কিন্তু ভরসা রেখেছে ভারসাম্যের ধারণায় -- ভিন্ন স্বার্থের সংঘাতের ফলে এক এমন জমি তৈরি হবে, যেখানে নানা মতের জায়গা থাকবে।কিন্তু অল্প কয়েকজনের হাতে সংবাদশিল্প চলে আসছে ক্রমশ, ফলে সেই প্রত্যয় আর থাকছে না। এও বহুবিদিত যে বেশিরভাগ স্বত্বধারী পরিবারেরই অন্যান্য ব্যবসা রয়েছে, এবং সংবাদপত্র বা টি.ভি. চ্যানেল তাদের মূল ব্যবসার একটি সংঘটক মাত্র। তাই সংবাদপত্রের আর সাংবাদিকের বিশ্বাসযোগ্যতায় এমন চিড় ধরেছে। হয়তো সেইজন্যই বিনোদনটুকু ছাড়া পাঠক বিশেষ কিছু আশা করে না।। আবার মালিকও 'লাইফস্টাইল' দিয়ে ভরিয়ে দিতে চায় পাতা, কিংবা করিনা কাপুরের চুম্বন - সংক্রান্ত কোনো অর্থহীন বিতর্ক দিয়ে। ফলে সাংবাদিকও এখন ক্লীব, কলমকে ভাড়া খাটায়। দুঃখের কথা, অনুসন্ধানী সাংবিদকতার কাজে, পেশাদার সাংবাদিকের চেয়ে অনেকসময়ে বেশি অগ্রণী হন অন্য পেশার মানুষ। ২০০১ সালের তীব্র খরায় রাজস্থানের মানুষের দুর্বিষহ অবস্থার কথা সিরিজের আকারে লিখেছিলেন সমাজবিজ্ঞানী জাঁ দ্রেজ। সরকারের খরাত্রাণের দাবির মুখ ঘষে দিয়েছিলেন মাটিতে। কোনো সাংবাদিক এই উদ্যোগ নেননি কেন?

সাংবাদিকতা নিয়ে মানুষের সংশয়, অবিশ্বাসকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে সাংবাদিককে। তবু নৈরাশ্যের দেওয়াল সত্যের সম্পূর্ণতাকে যেন ঢেকে দিতে না পারে, তা দেখতে হবে। একটি বিদেশি কাগজ লিখছে, ভারতে আজকের সংবাদপত্রকে

দেখলে বিংশ শতকের গোড়ার আমেরিকার কথা মনে পড়ে, যখন মানুষ বাস্তবিক বিশ্বাস করত যে সংবাদমাধ্যম রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করতে পারে। কিছুটা হলেও এ-চিন্তা ঠিক। নইলে নবসাক্ষর মানুষও ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে কেন কিনবে খবরের কাগজ? রাষ্ট্রযন্ত্রের, বাণিজ্যজগতের বৃহৎ জটিলতার কথা তাঁরা হয়তো কিছুটা বোঝেন, কিছুটা বোঝেন না। কিন্তু কারণেই হোক বা অকারণে, তাঁদের এখনো এই আশা রয়েছে যে, যে - কথা তাঁরা বলতে পারছেন না, যে - প্রশ্ন তাঁরা করতে পারছেন না, তা সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করবে। কেবল নতুন পাঠকইনন,পুরোনো পাঠকের সন্দেহের, নিরাশার কৃষ্ণতম মেঘের চারপাশেও এমন একটি আলো জেগে থাকে, তাই সকালে কাগজ পড়া এখনো স্রেফ 'সময় নষ্ট' হয়ে ওঠেনি।

যে - জমিতে প্রোথিত আশার এই শিকড়, সেখান থেকেই যদি রসগ্রহণ করে আজকের সাংবাদিক, তা হলে হয়তো বীজতলা নিঃশেষ হয়ে যাবে না। আজ আমরা এমন যুগে বাস করছি, যখন সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজি কাগজে সম্পাদকীর পাতা উঠে যাচ্ছে, সম্পাদকীয় কলাম নিলাম হচ্ছে, টাকার বিনিময়ে কর্পোরেট কর্তার ছবি ছাপা হচ্ছে, খবরের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের তফাত বুঝতে হিমসিম -- হয়তো সাংবাদিক নিজেও সব সময় সেই সূক্ষ্ম সীমারেখা চিনতে পারে না। চিন্তা করার যন্ত্রণা অনেক, চিন্তা না - করার প্রলোভন অপরিসীম। কিন্তু মালিকের কাছে সে - ব্যক্তি কর্মচারী, পাঠকই তাকে 'সাংবাদিক' করে তোলে। তখন নয়, যখন সাংবাদিক তাকে উদ্ধৃত করে, তার মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরে। সংবাদ - কর্মচারী থেকে মানুষ একজনকে সাংবাদিক করে তোলে তখন, যখন সে নিজের প্রশ্নের উত্তর পায় সাংবাদিকের কলমে। কী সেই প্রশ্ন ? মানুষের জীবনের তিন মৌলিকতম বিষয় যদি হয় আহার - নিদ্রা - মৈথুন, তা হলে প্রথম তিনটি প্রশ্ন, কী খাব, কোথায় শোব, আর কার সঙ্গে শোব। চতুর্থ কোন প্রশ্ন উসকোয় মানুষকে? মনে হয় সে - প্রশ্ন এই - কী ভাবব? কেমন করে চিন্তা করব আমরা চারপাশ নিয়ে, আমাকে নিয়ে, আমার জীবনকে নিয়ে? কীভাবে বুঝে নেব আমার অবস্থান, আমার চাওয়া - পাওয়ার সম্ভাবনা? এখানেই রাষ্ট্রের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির যোগ, আর সেই সীমারেখায় দাঁড়িয়ে থাকে সাংবাদিক। সতত সীমান্তবাসী সে, নিয়ত সীমান্তযুদ্ধের সাক্ষী। যে - সীমান্ত রোজ রচিত হয়, আবার ভাঙে, আবার আঁকা হয় রক্ত- অশ্রুতে। সে যদি থাকে অবচেতনে, এক মুহূর্তে বস্তুত বহু অগণিত লোক উদ্বাস্তু হয়ে যায়। তাই রাজ সমাজ - জমিনের জরিপ করতে হয় সাংবাদিককে, জোগাতে হয় চিন্তাসূত্র। এই তার সাধনা, তার ধর্ম, এ-ধর্মাচরণ ফুরোবার নয়। সাংবাদিক নিজে যদি রণে ভঙ্গ না দেয়, তবে সাংবাদিকের পায়ের তলায় এই জমিটুকু কেড়ে নেওয়া কঠিন। কারণ এখানে মানুষের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে তার যোগ। ব্রডশিটের বিস্তার যদি বা হয় ট্যাবলয়েডের আঁটসাঁট সংক্ষিপ্ততা, সংবাদ সংগ্রহের নামে হাজার আদেখলেপনা ঘটতে থাকে চারপাশে, সাংবাদিক চাইলে তার কলম এক গণ্ডুষ জলকে অকূল সমুদ্র করতে পারে। আজো পারে। এই সম্ভাবনাই এখন সম্বল সাংবাদিকের। আর এই সমাজের, এই সময়ের।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com